ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: প্রতিরোধের শক্তি

সামিনা লুৎফা

২৬ আগষ্ট ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থানের নবম বার্ষিকী। এই প্রবন্ধ রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার অধীনে ফুলবাড়ী আন্দোলন বিশেষণ করেছে। কী করে রাষ্ট্রের নির্মম বল প্রয়োগের মুখেও শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রবল প্রতিরোধ জারি রেখেছিল তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই গবেষণার একটি অংশ। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠার পেছনে কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব অনুসন্ধান এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এই বিষয়ে লেখকের পিএইচডি থিসিসের একটি অধ্যায় এখানে অনুবাদ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় কোন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কেমন হবে, সেই বিশ্লেষণ সমাজবিষয়ক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এই অনুসন্ধানে খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলো আবার পরস্পরবিরোধী। দমন-পীড়ন প্রক্রিয়া আন্দোলন থামাতে পারে না, বরং এর পালে হাওয়া দেয়– এমন বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে দুই যুক্তিই রয়েছে। এখানে ঘটনা অনুসন্ধানে বাংলাদেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি বিরোধী ফুলবাড়ী আন্দোলনকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই আন্দোলনে আমরা দেখেছি, কী করে রাষ্ট্রের নির্মম বল প্রয়োগের মুখেও শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রবল প্রতিরোধ জারি রেখেছিল। এই আলোচনা আমার বিষয়ভিত্তিক গবেষণার একটি অংশ। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠার পেছনে কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব অনুসন্ধানই এই গবেষণার লক্ষ্য।

প্রেক্ষাপট

'আমরা রক্ত দিয়েছি, তাইতো আন্দোলনটি আজ এ পর্যায়ে এসেছে... রক্তের দাগ ছাড়া এটি কখনোই অর্জন করা সম্ভব হতো না। এটি ছিল আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। পরিস্থিতি আমাদের সাহস জুগিয়েছিল। আমরা রাজপথ দখলে রেখেছিলাম। অধিকার আদায়ে জীবন দেয়া স্বজনদের ঋণ পরিশোধে এটা ছিল আমাদের অবশ্যকর্তব্য।'

–রবিন, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় তরুণ গায়ক, ফুলবাড়ী, ২০১০

সেটা ছিল ২০০৬ সাল। বাংলাদেশের ছোট্ট একটি শহর ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লা খনির বিরুদ্ধে স্থানীয়দের আন্দোলন তখন বেশ জোরদার। কয়েক লাখ মানুষের উচ্ছেদ আতঙ্ক, অকল্পনীয় পরিবেশদূষণের শঙ্কা আর জ্বালানি নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে আবির্ভূত এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সকলেই ছিল একাট্টা। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনে ছিল জাতীয় কমিটিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সমর্থন। ২৬ আগস্ট প্রায় ৭০ হাজার মানুষ উন্মুক্ত কয়লা খনির কাজের দায়িত্ব পাওয়া কোম্পানির স্থানীয় অফিস ঘিরে ফেলার কর্মসূচি দেয়। ওই কোম্পানিই বিরামপুর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী আর নবাবগঞ্জ–পাশাপাশি অবস্থিত এই চার উপজেলার ৫ হাজার ৬০০ হেক্টর আবাদি জমি খুঁড়ে কয়লা উত্তোলনের আয়োজন করছিল। সে সময় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে জমায়েত মানুষের ওপর সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। গুলি করে হত্যা করে তিনজন আন্দোলনকারীকে, সেই সাথে ওই হামলায় আহত হয় শতাধিক[২]। এ ঘটনার পর জারি করা হয় কারফিউ। নানা মাত্রায় শুরু হয় দমন-পীড়ন; যদিও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তখন ক্ষমতায় আসীন।

রাসলার (১৯৯৬: ১৪৯) এর মতে, কোনো আন্দোলনে এরূপ দমন-পীড়ন পরবর্তী পর্যায়ের ধারাবাহিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, নিরাপত্তা শঙ্কায় আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা হ্রাস পায়। কিন্তু ফুলবাড়ী আন্দোলনে ঠিক তার বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাই।

এরূপ অবস্থায় আন্দোলনের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ গবেষণায় উঠে আসা চিত্র আর দশটা আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দাবি আদায়ে ফুলবাড়ী আন্দোলনের অর্জিত সাফল্য উদাহরণ হিসেবে খুব একটা বেশি নেই। সরাসরি গুলি চালিয়ে দেয়ার মতো ঘটনার পর আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ছন্দপতন হয়নি, বরং তা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। পুরো শহর আন্দোলনকারীদের দখলে চলে যায় এবং টানা আন্দোলনের পঞ্চম দিনে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হয়। আন্দোলনকারীদের চাপে সরকার যে শুধুমাত্র ফুলবাড়ী অঞ্চলে খনিসংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করে তা নয়, বরং দেশের কোথাও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হবে না– এমন ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু কয়লা উত্তোলনের দায়িত্বে থাকা যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানিটির ভাবমূর্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গত দুই দশকে উত্তোলনক্ষেত্রে বিনিয়োগ 'উত্তর' থেকে 'দক্ষিণে' সরে আসার রূপরেখা সংক্রান্ত গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ না হতে চাওয়া মানুষের খনিবিরোধী স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। পৃথিবীজুড়ে বহু বাঁধ এবং অন্তত কয়েক হাজার উন্মুক্ত পদ্ধতির খননকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলতে গেলে কোনো রকম প্রতিরোধ ছাড়াই। এর মধ্যে হাতে গোনা যে কয়টি ব্যতিক্রম আছে, সেগুলোই পরিণত হয়েছে গবেষণার বিষয়ে, সেই সাথে

হয়ে উঠেছে আন্দোলনকারীদের প্রেরণার উৎস (ব্যাভিস্কার, ২০১৪; ডোয়েল, ২০০২; অয়াইডেনার, ২০০৭; টেইলর, ২০১১; অলিভার, ১৯৯৯; কালাফুট, ২০০৮)। ফুলবাড়ী আন্দোলন তেমনই একটি ঘটনা। দৃশ্যত ক্ষমতাহীন একটি জনগোষ্ঠী কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল প্রকার দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকে রইল, তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

আবেগ ও কর্তব্যবোধ– এ দুইকে ঘিরে আমি আমার গবেষণাকাজ এগিয়ে নিয়েছি। আর এর ভিত্তি হচ্ছে ৫১ জনের কাছ থেকে সংগৃহীত ভাষ্য।

রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও চরমতম হুমকির মুখেও ঘটনা-পরবর্তী তাৎক্ষণিক উত্তেজনা এবং এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই আন্দোলনের জনসম্পৃক্ততার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে কোনো কোনো আন্দোলনকারীর বয়ানে উঠে এলেও আমি তাতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি।

আন্দোলন দমনের সহিংস প্রক্রিয়ায় কিভাবে প্রতিবাদী বারুদে উত্তেজনার আগুন লাগল, আমার অনুসন্ধানে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। উত্তর খুঁজেছি, কোন মন্ত্রবলে রাষ্ট্রের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের পরেও মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে না গিয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকল? এবং ঘটনার পরবর্তীতে রাষ্ট্র এবং প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা কী ছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, যখন রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ফুলবাড়ীতে নাগরিকদের রক্ষার বদলে জীবন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন মানুষ উত্তেজনাতাড়িত হয়ে সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্যরকম এক মাত্রা দান করে। এই চরম সন্ধিক্ষণে মানুষ তখন রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেই একমাত্র প্রতিরোধের পথ হিসেবে খুঁজে পায়। আন্দোলনে ব্যর্থতার ফলাফলের চিন্তা তাদেরকে বিচলিত করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, নৃশংসভাবে মানুষ হত্যার এই বিষয়টিকে আন্দোলনকারীরা দমন-পীড়নের চরম রূপ হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। এ ঘটনায় তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাটা তাদের অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মৃতের প্রতি স্বজনদের কর্তব্যবোধ যে এই আন্দোলনের অন্যতম সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, তা আমার গবেষণায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। স্বজন হারানোর শোকের মশাল এই আন্দোলনকে পথ দেখিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রিত রেখেছে। এই আবেগ ও কর্তব্যবোধ সকলের মনে প্রতিটি মুহূর্তে জাগরূক থেকেছে।

যখন রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ফুলবাড়ীতে নাগরিকদের রক্ষার বদলে জীবন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন মানুষ উত্তেজনাতাড়িত হয়ে সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্যরকম এক মাত্রা দান করে। এই চরম সন্ধিক্ষণে মানুষ তখন রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেই একমাত্র প্রতিরোধের পথ হিসেবে খুঁজে পায়।

উপাত্ত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে আমার মাঠপর্যায়ের গবেষণাকালে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা এগিয়ে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ফুলবাড়ী, ঢাকা ও লন্ডনে নেয়া ৬৪টি সাক্ষাৎকার। সেই সাথে আছে ২৬ তারিখের ঘেরাও কর্মসূচি এবং এর পরবর্তী কার্যাবলির ওপর নানামাত্রিক বিশ্লেষণ। সাক্ষাৎকারগুলোর ৫৯টির মধ্যেই ২৬ ও ২৭ আগস্টের বর্ণনা রয়েছে, যা আমার গবেষণায় নানা সময়ে উঠে এসেছে।

ফুলবাড়ী আন্দোলন : তথাকথিত উন্নয়নতত্ত্বের মোকাবিলা

কয়লা খনন কার্যক্রম ফুলবাড়ী, বিরামপুর, পার্বতীপুর ও নবাবগঞ্জ–এই চার উপজেলাজুড়ে বিস্তৃত থাকলেও এ প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানত ফুলবাড়ীকে ঘিরেই। খনিবিষয়ক কার্যক্রমের শুরু থেকেই স্থানীয় প্রতিরোধের সূচনা হয়েছিল এবং এর তিন মাস পর তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাথে স্থানীয় সংগঠকদের যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে গতির সঞ্চার হয়। এর বছরখানেক পর জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখা কোম্পানির স্থানীয় অফিস ঘেরাও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আন্দোলনে হামলার পরপরই নৃশংসতার প্রতিবাদে ওই চার উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল আহ্বান করা হয়। এরপর টানা চার দিন ওই অঞ্চলে সকাল-সন্ধ্যা স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। সেই সাথে ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে চলতে থাকে নানা কর্মসূচি। ঘটনার তৃতীয় দিনে আন্দোলন চরমতম পর্যায়ে পৌঁছায়। ওই দিন ফুলবাড়ী শহরের রাস্তা দখলে নেয় হাজার হাজার মানুষ। চতুর্থ দিনে (৩০ আগস্ট ২০০৬) আন্দোলনকারীরা এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। ওই দিন বাংলাদেশ সরকার ফুলবাড়ী এলাকায় কয়লা খনি খননের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে এবং আন্দোলনকারীদের সকল দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

কয়লা খনির কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে মানুষের ওপর চালানো রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং এর বিপরীতে ফুঁসে ওঠা মানুষের প্রতিবাদের মুখে কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণার মাঝেই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে উচ্ছেদকৃত মানুষের জীবনের ওপর বিরূপ প্রভাব নানা অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। কিন্তু কিভাবে মানুষ তার নিজের শক্তির জায়গাটিকে চিহ্নিত করে এর মোকাবিলা করতে পারে, সেটির আলোচনা জারি রাখাটাও জরুরি। এ ধরনের আলোচনায় দুটি বিষয়ে বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. আন্দোলন দমাতে চালানো দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়া এবং দুই. স্থানীয় আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

অনাচার, প্রতিরোধ এবং বিচক্ষণতার রাজনীতি

আগেই বলা হয়েছে যে, আন্দোলন দমনে বল প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। পরস্পরবিরোধী তথ্যের উপস্থিতি প্রক্রিয়াটিকে আরো জটিল করে তোলে (আর্ল, ২০০৬; রাসলার, ১৯৯৬)। কিন্তু এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে প্রাথমিক উত্তেজনা কিংবা আবেগের প্রভাব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিপরীতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে সাংস্কৃতিক প্রভাব।

গুডউইন, জেসপার ও পলেটার (২০০৩)-এর মতে, প্রতিবাদী জনগণের ওপর নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভয় ও ক্রোধের মাধ্যমে। এই ভাবাবেগের সম্মিলিত প্রকাশ সকলকে আরো সংগঠিত করতে অনুঘটকের কাজ করে (গুডউইন, জেসপার ও পলেটা, ২০০৩; হেস ও মার্টিন, ২০০৬; রীড ২০০৪:৬৫৩; স্ক্রুড ও ভীলমায্, ২০০৭)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষের কর্মোদ্যোগ বুঝতে এই ভাবাবেগ বিশ্লেষণ জরুরি। আকস্মিক ক্রোধ প্রতিবাদকে উসকে দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে আন্দোলনের সমর্থনে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে, যা মিডিয়া প্রভাবিত হয়ে দমন-পীড়নের বিপরীতে বহুমাত্রায় প্রকাশিত হয় (ফ্রান্সিসকো, ২০০৪; হেস ও মার্টিন, ২০০৬)।

আন্দোলনকারীদের চৌকস অবস্থান

ফুলবাড়ী শহরে অবস্থিত সুজাপুর স্কুল প্রাঙ্গণে জমায়েত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই স্থানটি কোম্পানি অফিসের খুবই নিকটে অবস্থিত ছিল। জমায়েত-পরবর্তী পরিকল্পনায় এই অফিস ঘেরাওয়ের কথা ছিল। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের ভাষ্য মতে, ঘেরাওয়ের আগের দিন রাতে জমায়েত স্থান সুজাপুর স্কুল থেকে জিএম পাইলট স্কুলে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এর মানে দাঁড়ায়, জাতীয় কমিটি এবং স্থানীয় সংগঠকবৃন্দ সকল প্রকার সহিংসতা এড়িয়ে যেতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সাথে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায় যে, জমায়েতস্থলে 'দালাল'দের প্ররোচনায় যেন সহিংসতা উসকে উঠতে না পারে সে উদ্দেশ্যে ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রস্তুত রাখা হয়। সেই সাথে এত অল্প সময়ের নোটিশে সুশৃঙ্খলভাবে জমায়েত স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনার মাধ্যমেও বোঝা যায় যে, আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি কতটা জনসম্পৃক্ত ছিল।

সাঁওতাল, পাহান ও মুণ্ডা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা তীর-ধনুক এবং ঢোল নিয়ে তাদের ঐতিহ্যগত সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। মহিলারা এসেছিল ঝাড়ু আর লাঠি নিয়ে। পুরুষদের সাথে ছিল বাঁশের তৈরি লাঠি। নেতৃবৃন্দ অবস্থান করছিলেন ট্রাকের ওপর তৈরি করা এক অস্থায়ী মঞ্চে। পুরো জমায়েতজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করলেও তা পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত ছিল না। শুরু থেকেই সংগঠকবৃন্দ আয়োজনে যে কোনো প্রকারের সহিংস পরিস্থিতি এড়াতে বেশ সজাগ ছিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ সমাবেশস্থলের দিকে আসতে থাকে। লোকসমাগম হয় আয়োজকদের প্রত্যাশার চাইতেও বহুগুণ বেশি। অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এসেছিল ফুলবাড়ী শহরের বাইরে নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর, ও বিরামপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। সেখানে ঢাকা, রাজশাহী এবং অন্যান্য জেলা থেকে আগত মানুষও ছিল। সাঁওতাল, পাহান ও মুণ্ডা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা তীর-ধনুক এবং ঢোল নিয়ে তাদের ঐতিহ্যগত সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। মহিলারা এসেছিল ঝাড়ু আর লাঠি নিয়ে। পুরুষদের সাথে ছিল বাঁশের তৈরি লাঠি। নেতৃবৃন্দ অবস্থান করছিলেন ট্রাকের ওপর তৈরি করা এক অস্থায়ী মঞ্চে। পুরো জমায়েতজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করলেও তা পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত ছিল না। শুরু থেকেই সংগঠকবৃন্দ আয়োজনে যে কোনো প্রকারের সহিংস পরিস্থিতি এড়াতে বেশ সজাগ ছিলেন।

বিকেল ৩টায় জিএম পাইলট স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে কোম্পানি অফিস ঘেরাও করতে 'ছোট যমুনা' নদী অভিমুখে মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। নদীর অপর পাশেই ছিল কোম্পানি অফিস। মিছিলটি আটকে দিতে নদীর ওপর ব্রিজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দানকারীদের ধারণা ছিল, তাঁদেরকে ব্রিজে ওঠার পূর্বেই উর্বশী সিনেমা হলের সামনে বাধা দেয়া হবে।

ব্রিজের পূর্ব পাশের প্রথম ব্যারিকেডের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে মিছিলটি থেমে যাবার নির্দেশ দিল। নেতৃবৃন্দের সাথে এ নিয়ে শুরু হলো বাগ্‌বিতণ্ডা। জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলে ম্যাজিস্ট্রেট সকলকে নিশ্চিত করলেন যে, কোম্পানির কার্যক্রম আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফুলবাড়ী এলাকা থেকে গুটিয়ে নেয়া হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পর পরবর্তী কর্মসূচি বর্ণনা করে ঘেরাও কর্মসূচির সেখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচি শেষ করে নেতৃবৃন্দ জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী অফিসে ফিরে যাবার মুখেই কর্মসূচি শেষে ফিরতে থাকা মানুষের ওপর গুলি করা হয়েছে। এ খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নেতৃবৃন্দ নিমতলী মোড়ে অবস্থান নেন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর নির্বিচার গুলি চালানোর প্রতিবাদে ফুলবাড়ীতে অনির্দিষ্টকালের হরতাল আহ্বান করেন। এরপর স্থানীয় আন্দোলনকারীরা জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দকে প্রথমে ফুলবাড়ী অফিসে নিয়ে আসে এবং পরে সেখান থেকে গোপনে তাঁদের ঢাকা ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। তখনো অসংখ্য আন্দোলনকারী রাস্তাঘাট দখলে রেখেছিল। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তখনো চলছিল।

বাস্তবে কী ঘটেছিল?

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঠিক কী কারণে নির্বিচার গুলিবর্ষণে উদ্যত হলো, তা জানা প্রায় অসম্ভব। আমার মতে, সে সময় সকলেই ছিল দ্বিধান্বিত আর মুখোমুখি অবস্থানে থাকা দু'পক্ষের মধ্যে কোনো রকমের যোগাযোগ ছিল না। গ্রামবাসীরা ছিল ক্রুদ্ধ আবার একই সাথে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দমন-পীড়নের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। দ্বিতীয়ত, প্রশাসন এত বিশাল জনসমাগমের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই দ্বিধান্বিত পরিস্থিতি প্রশাসনকে ভুল পদক্ষেপ নিতে প্রভাবিত করেছিল। তৃতীয়ত, এ ঘটনায় কোম্পানির ইন্ধনের ব্যাপারটিকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ব্রিজের ওপরে বিডিআর জওয়ানদের সাথে কোম্পানির কয়েকজন কর্তাব্যক্তিকেও দণ্ডায়মান থাকতে দেখা গেছে।

রক্ত, ঘাম আর অশ্রু : এক আবেগঘন সংমিশ্রণ

এখনকার আলোচনায় দ্রুত পাল্টাতে থাকা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে

মানুষের আবেগ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে কতটুকু মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব। গুলি চালানোর সাথে সাথে মানুষের সম্মিলিত আবেগ পুরো ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আমি যাঁদের সাথে কথা বলেছি, তাঁদের কেউই গুলি চালানোর ঘটনাটি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একজন বলেন,

'বুঝতে পারছিলাম না কী করব। আমি শুধু ব্রিজের এমাথা থেকে ওমাথায় ছোটাছুটি করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না এটা কি আমার ভয় ছিল নাকি শোকের প্রকাশ! আমি জানতাম না যে সেখানে কী ঘটেছে। আমি এখনো গুলি চালানোর কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না।'

গুলির ঘটনায় ভীতবিহ্বল মানুষকে আরো হত্যাকাণ্ড ঘটার শঙ্কা, গ্রেফতার হওয়া কিংবা মার খাওয়ার ভয় আর স্বজন হারানোর আতঙ্ক দিশেহারা করে দিয়েছিল। এর ফলে প্রতিবাদ অনুষ্ঠানের আমেজ নিমেষেই উবে যায়। মানুষের এই সম্মিলিত ভাবাবেগই প্রতিরোধী হয়ে ওঠার পেছনে অনুঘটকের কাজ করে আর ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত নেতৃবৃন্দ অনির্দিষ্টকালের হরতালের ডাক দেন। যদিও ফ্রান্সিসকো (২০০৪)-এর মতে, হত্যাযজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় হরতাল কিংবা ধর্মঘট আহ্বান কম ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু আমার মতে, ওই রকম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে (যখন আন্দোলনকারীরা রাজপথ দখলে রেখেছে আর ওই ঘটনায় তিনজন আন্দোলনকারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, যাদেরকে খুব কাছ থেকে হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলি করা হয়) জীবন রক্ষায় পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য যে কোনো কর্মসূচি বা কাজে প্রবৃত্ত হওয়াটাই ছিল মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ফুলবাড়ী শহর আর এর আশপাশের অঞ্চলের মানুষ তখন ভীতসন্ত্রস্ত আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। দুশ্চিন্তা আর ক্ষমতাহীনতার অসহায়ত্ব চারপাশে ঘিরে ধরেছিল।

> **মৃতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেই আন্দোলনকারীরা তাদের দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং যে আন্দোলনে শরিক হয়ে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেটির দাবি পূরণের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার শপথ নিয়েছিলেন।**

জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঘোষিত কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে প্রচারমাধ্যমে ঘটনাটি উঠে আসে। এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেশ ও দেশের বাইরে মিডিয়াগুলোতে এই বর্বর আক্রমনের খবর ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বহু কষ্টে তাঁদের অবস্থান গোপন করেন। কারফিউ জারির পর পুরো শহর পরিণত হয় ভয় আর হতাশার রাজ্যে।

আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে এবং টেলিভিশনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের শহরে ফিরে যাওয়ার সংবাদ দেখে হতাশাগ্রস্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। তাদের মনে তখন এক বিশাল শূন্যতা অনুভূত হতে থাকে। যে দেশে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি এলাকার মানুষের চরম অবিশ্বাস বিরাজমান, সে দেশে চরম সংকটকালীন এক পরিস্থিতিতে ফুলবাড়ী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীদের আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে ওঠা সত্যিই বিস্ময়কর। এর মাধ্যমে হতাশাচ্ছন্ন আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক উত্তেজনাতাড়িত হয়ে হাতে গোনা কয়েকজন আন্দোলনকারীর চরম প্রতিবাদী রূপই যে আন্দোলন-পরবর্তী ঘটনাসমূহকে চালনা করেছে তা নয়, বরং ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণেই ফুলবাড়ী আন্দোলন পরিপুষ্টতা লাভ করেছে । নেতৃবৃন্দের আত্মগোপনে চলে যাওয়াটাও ছিল বিজ্ঞতার পরিচায়ক। এর ফলে একদিকে যেমন তাদের জীবন বেঁচেছে, অপরদিকে সংবাদমাধ্যমে নেতৃত্ববিহীন পরিবেশে নিষ্ঠুর এই হামলার ব্যাপক প্রচারে পরদিন সকালে জনতা আবার ঠিকই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের উন্মত্ত আচরণে তখন সকলের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পরই রাষ্ট্রীয় বাহিনী নির্বিচারে সকলকে লাঠিপেটা করা শুরু করেছিল। ফলশ্রুতিতে যারা প্রথম দিকে আন্দোলনের বাইরে ছিল, তাদের নিরাপত্তাবোধের জায়গাটিও আর রইল না। এই নির্বিচার অত্যাচার-নিপীড়নের ফলে পালিয়ে বাঁচার পথটিও যখন বন্ধ হয়ে গেল, ঠিক তখনই ওই অঞ্চলের মানুষ ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে যায়। আতঙ্ক পরিণত হলো আক্রোশে, ক্রোধ পরিণত হলো শক্তিতে।

ক্রোধতাড়িত প্রতিরোধকালের সূচনা পর্ব

পরের দিন সকাল থেকেই পুরো শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠতে শুরু করে। গোলাপাড়া এলাকার একজন গৃহিণী এবং একজন নারীকর্মীর নেতৃত্বে সমবেত জনতার ক্ষোভের স্ফুরণ শুরু হয়। স্থানীয় নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টা পর শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। গোলাপাড়ার নারীরা কারফিউ ভেঙে মূল সড়কে উঠে পড়তে উদ্যত হয়। সশস্ত্র বিডিআর আর পুলিশ বাহিনীর মোকাবিলায় তারা মরিচের গুঁড়া, রান্নার কাজে ব্যবহৃত ছুরি, ঝাড়ু নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কারফিউ ভাঙতে স্থানীয় নেতারা তাদের পেছনে থেকে চেষ্টা করছিলেন আরো বেশি মানুষ জড়ো করতে। জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখার নেতারা অবস্থান করছিলেন উত্তর দিকে। এরই মাঝে গণফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বিডিআরের ব্যারিকেড ভেঙে মূল সড়কে পৌঁছে যান। একই সময়ে বণিক সমিতির নেতা সড়কের দক্ষিণ দিকে সকলকে সমবেত করার চেষ্টা করতে থাকেন। এমনিভাবে একপর্যায়ে দুই দিক থেকে মিছিল করে ব্যারিকেড ডিঙিয়ে জনতা মূল সড়কের দখল নিয়ে নেয়। জনতার প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে পুলিশ স্টেশনে ফিরে যেতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে আপাত ক্ষমতাহীন সমবেত জনতার সত্যিকারের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রথম দৃশ্যের সূচনা হয়েছিল।

দুপুরের দিকে বিডিআর প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সেদিনকার রাতের ধারণকৃত ভিডিও দৃশ্যে সকলের চোখে বিশ্বাসের ঝিলিক আর মুখে স্বস্তির আবেশ স্পষ্টতই বোঝা যায়।

আগ্রাসনের বিপরীতে প্রতিরোধের গর্ব

সেদিন দুপুরেই গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। মৃতের সত্যিকারের সংখ্যার বিষয়ে কেউই নিশ্চিত ছিল না। ২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে পাঁচ-সাতজন

নিহত হবার খবর পাওয়া যায়। পুরো সময়জুড়ে রাষ্ট্রের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠার ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়। এতে একদিকে প্রাধান্য পায় রাষ্ট্রের নির্মম আগ্রাসী আচরণের ফলে স্বজন হারানোর শোক আর অপরদিকে ফুটে ওঠে নিপীড়নের মুখে মানুষের প্রকৃত শক্তি উদ্‌ঘাটনের স্বস্তি আর গর্ব।

জানাজা এবং মৃতের প্রতি কর্তব্যবোধের শপথ : প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুঘটকীয় উপাদান

গণসংহতি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ৭১ বছর বয়স্ক বাম রাজনৈতিক নেতা সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে বলেন-

'আমার তখন মনে হয়েছে যে, আমরা বুঝি প্যালেস্টাইনে আছি। ছোট ছোট ছেলেগুলি বন্দুক তাক করে এগিয়ে আসা বাহিনীর দিকে ঢিল ছুড়ছিল আর এর জবাবে ছুটে আসছিল বুলেট। জমির ওপর আমাদের অধিকার রক্ষায় তিন তরুণ বুকের রক্ত ঢেলে দিল। এরপর কি আর ঘরে বসে থাকা যায়!'

অন্যান্য আন্দোলনকারীর সাথে কথা বলে প্রায় একই রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। জানাজায় অংশগ্রহণের বিষয়টিকে মৃতের প্রতি জীবিতদের হক আদায় হিসেবেই দেখা হয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটা হচ্ছে 'ফরজে কিফায়া'। পুরো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মৃতের প্রতি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষমদের প্রতি জানাজায় অংশগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। মুসলিম সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ কিংবা গণহত্যায় মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জানাজার নামাজে ঐতিহ্যগতভাবেই ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। আর এটিকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ হিসেবেই দেখা হয়।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ভাষ্য মতে, ২৭ আগস্ট দুপুর থেকেই শহরের আশপাশের গ্রামগুলো থেকে মানুষ মূল সড়কে জড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু গুলিবর্ষণের ঘটনায় মানুষের সামষ্টিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে নেতা-কর্মীরা চিন্তিত ছিল। মৃতের প্রতি সামষ্টিক কর্তব্যবোধের শপথ নিতে ২৭ আগস্ট আসরের ওয়াক্তের পর আয়োজিত 'গায়েবানা জানাজা' অনুষ্ঠান আন্দোলনের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে টনিকের মতো কাজ করেছিল। এই জানাজায় সকলের অংশগ্রহণকে ধর্মচিন্তার বাইরে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। বাম আন্দোলনকর্মীদের তৎপরতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠান প্রচারমাধ্যমের নজর কেড়েছিল। জানাজায় অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই ছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে একেকটি প্রতিবাদী সত্তা। কিন্তু এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর কিছুই করার ছিল না। স্থানীয় এক নেতার মতে,

'গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ। এর মাধ্যমে জনসাধারণ অতি সহজেই কারফিউ উপেক্ষা করে পুলিশ ও বিডিআরের ধরপাকড় এড়িয়ে একত্রিত হতে পেরেছিল।'

আরেকজন বলেন,

'মুসলমান অধ্যুষিত দেশ হওয়ায় বিডিআরের পক্ষে জানাজায় অংশ নেয়া মানুষের ঢল ঠেকানো ছিল অসম্ভব।'

রাষ্ট্রীয় বাহিনী হয়তো বা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই কোনো বাধা তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু সাধারণের চোখে এটা কেবলমাত্র যে ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করার বিষয় ছিল তা নয়, বরং এটা ছিল কারফিউ ভেঙে বেরিয়ে এসে সম্মিলিত প্রতিবাদের একটা বিশেষ রূপ। কারফিউ উপেক্ষা করে জানাজায় অংশ নেয়া এবং বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথই ছিল মৃতের প্রতি জীবিতদের প্রকৃত কর্তব্যবোধ বা 'ফরজে কিফায়া'। মৃতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেই আন্দোলনকারীরা তাদের দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং যে আন্দোলনে শরিক হয়ে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেটির দাবি পূরণের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার শপথ নিয়েছিলেন। যদিও আন্দোলনকারীরা সকলেই মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু আরবি 'ফরজ' শব্দের অর্থ এখানে ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনীন মাত্রা পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ষাটোর্ধ্ব অমুসলিম হুরমতি বলেন-

'র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর গাড়ি শহরে ঢোকা ঠেকাতে আমরা মহাসড়কে পাহারা বসিয়েছিলাম। আমরা সেখানেই থেকেছি, খেয়েছি, এমনকি ঘুমিয়েছি পর্যন্ত। ওরা নিরপরাধ মানুষকে গুলি করেছিল... ফুলবাড়ীর আন্দোলনকারীদের সাহায্য করা তখন আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল... বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানেই থাকব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এটা ছিল আমাদের জন্য ফরজ।'

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'ফরজ' শব্দটি তখন অভিন্ন রূপে উঠে এসেছিল। আক্ষরিক অর্থে 'অবশ্যকর্তব্য' হলেও ঘটনার প্রেক্ষিতে এই 'ফরজ' পালন না করলে সমাজে 'দালাল' হিসেবে সাব্যস্ত হবার ভয় ছিল, যা ছিল চরম লজ্জার। ২৯ বছর বয়স্ক গ্রাম্য ডাক্তার এজিদ এ রকম দালালদের সামাজিক শাস্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,

'এক লোক গ্রামে খনি কার্যক্রম চালানোর পক্ষে কথা প্রচার করে বেড়াত। ২৭ তারিখের পর ওই লোককে সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়... গ্রামবাসীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা জুতার মালা তাকে সকলের সামনে পরিয়ে দেয়া হয়। সেদিন তাকে সকলের সামনে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে আর কখনো কোম্পানির দালালি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।'

গুলি চালানোর ঘটনাটি সামাজিক কর্তব্যবোধের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ঘটনাকে সকলে তখন ফরজ কাজ হিসেবেই ধারণ করতে শুরু করে। আন্দোলনে অংশ নেয়া মানুষ তখন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিণতি নিয়ে মোটেই চিন্তিত ছিল না। এমন প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে কোনো পূর্বপ্রস্তুতিও ছিল না। কিন্তু ২৭ তারিখের জানাজা অনুষ্ঠান পুরো দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছিল। এর ফলে মানুষ কারফিউ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে। এ ঘটনা একত্রিত হয়ে খনিবিরোধী সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

শেষ কথা

এই আলোচনায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে চালানো রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ফলশ্রুতিতে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কোন প্রক্রিয়ায় মানুষের ভাবাবেগ এবং সম্মিলিত কর্তব্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার গবেষণায় ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি অনুসন্ধানের কাজটি করেছি। এতে পৃথক কিছু বিষয় সামনে উঠে এসেছে, যার মধ্যে আবার খুব সামান্যই বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো একসাথে জোড়া লাগালে দেখা যায়, খনিবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার কার্যকারণ একটি নয়, বরং অনেকগুলো। আন্দোলনে অংশ নেয়া মানুষের অবস্থান যে এক ছিল তা-ও নয়, বরং ভিন্ন ভিন্নভাবেই সবাই একে ধারণ করছিল। আন্দোলন গড়ে ওঠার কার্যকারণগত বিশ্লেষণে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেলেও অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যই ছিল এক।

কী করে তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থেকেও প্রতিবাদমুখর জনতাকে উসকে দিয়েছিল, তা অনুসন্ধানই ছিল আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সংকটময় পরিস্থিতিতে মৃতের প্রতি ঐতিহ্যগত দায়িত্ব পালনের আওতায় সবাইকে এক করতে পেরেছিলেন। এর ফলে রাষ্ট্রের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ রাজপথের টানা আন্দোলন জারি রেখেছিল। সংবাদমাধ্যমও এই ঘটনা প্রচারে এক গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সকল অনুঘটকের সম্মিলনে রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে ফুলবাড়ীর সফল আন্দোলন অনাগত দিনগুলোতে দাবি আদায়ে যে সকলের প্রেরণা হয়েই থাকবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সামিনা লুৎফা: সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: nitrasam21@yahoo.com

[লেখাটি সামিনা লুৎফার 'Confronting the Juggernaut of Extraction: Local, National and Transnational mobilisation against the Phulbari Coal Mine' শীর্ষক পিএইচডি গবেষণার একটি অধ্যায়ের অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ***মওদুদ রহমান***]

তথ্যসূত্র:

[ব্যাভিস্কার, ২০১৪] Baviskar, A. (2004), In the belly of the river : tribal conflicts over development in the Narmada Valley, Delhi: Oxford University Press

[বব ও নেপস্ট্যাড, ২০০৭] Bob, C. and S. E. Nepstad (2007), ÒKill a Leader, Murder a Movement?: Leadership and assassination in Social MovementÓ, American Behavioral Scientist, vol. 50, no. 10, pp 1370-1394.

[কোটল, ২০০৬] Cottle, S. (2006), ÒMediatized Rituals: beyond manufacturing consentÓ, Media, Culture and Society, vol. 28, no. 3, pp 411-432.

[ডোয়েল, ২০০২] Doyle, T. (2002), "Environmental Campaigns against Mining in Australia and the Philippines", Mobilization: An International Quarterly, vol. 7, no. 1, pp. 29-42

[আর্ল, ২০০৬] Earl, J. (2006), ÒIntroduction: Repression and the Social Control of ProtestÓ, Mobilization: An International Quarterly, vol. 11, no. 2, pp. 129-143

[ফ্রান্সিসকো, ২০০৪] Francisco, R.A. (2004), ÒAfter the Massacre: Mobilization in the Wake of Harsh RepressionÓ. Mobilization: An International Quarterly, vol. 9, no. 2, pp. 107-126

[গুডউইন ও অন্যান্য, ২০০০] Goodwin, J., J.M. Jasper, F. Polletta (2000), ÒThe Return of the Repressed: The Fall and Rise of Emotions in Social Movement TheoryÓ, Mobilization: An International Quarterly, vol. 5, no. 1, pp. 65-83.

[গুডউইন ও অন্যান্য, ২০০১] Goodwin, J., J.M. Jasper, F. Polletta (2001), ÒWhy Emotions Matter?Ó, in Goodwin, Jasper and Polletta (eds): Passionate Politics: Emotions and Social Movements, pp. 1-24, Chicago: University of Chicago Press.

[হেস ও মার্টিন, ২০০৬] Hess, D. And B. Martin (2006), ÒRepression, Backfire, and the Theory of Transformative EventsÓ, Mobilization: An International Quarterly, vol. 11, no. 2, pp. 249-267

[হর্টন, ২০১০] Horton, L.R. (2010), "Defenders of Nature and the Comarca: Collective Identity and Frames in Panama", Mobilization: An International Quarterly, vol. 15, no. 1, pp. 63-80

[কালাফু ও মুডি, ২০০৮] Kalafut, J., and R. Moody (2008), Phulbari Coal Project: Studies on Displacement, Resettlement, Environmental and Social Impact, Dhaka: Shamhati

[ম্যাথুয ও কোটল, ২০১১] Matthews J and S Cottle (2011), ÒTelevision News Ecology in the United Kingdom: A study of Communicative Architecture, Its Production and MeaningsÓ, Television and New Media, vol. XX, no. X. pp 1-21

[অলিভার ও রথম্যান, ১৯৯৯] Oliver, P. E., and F. D. Rothman (1999), "From Local to Global: The anti-dam Movement in Southern Brazil, 1979-1992", Mobilization: An International Journal, vol. 4, no. 1, pp. 41-57.

[অবি, ২০০০] Obi, C. I. (2000), "Globalization and Local Resistance: The case of Shell versus Ogoni", in Barry K Gill (ed.), Globalization and the Politics of Resistance, pp. 280-94, Basingstoke: MacMillan.

[রাসলার, ১৯৯৬] Rasler, K. (1996), ÒConcessions, Repression, and Political Protest in the Iranian RevolutionÓ, American Sociological Review, vol. 61, no. 1, pp. 132- 152.

[রীড, ২০০৪] Reed, Jean-Pierre (2004), ÒEmotions in Contexts: Revolutionary Accelerators, Hopes, Moral Outrage, and other Emotions in the Making of NicaraguaÕs RevolutionÓ, Theory and Society, issue 33, pp. 653-703

[শ্রুড ও ভীলমায্, ২০০৭] Schrodt, P. A. and O. Yilmaz (2007), "Sub-state Actor, Temporal and Geographical Dimensions of the Dissent-Repression Relationship: Evidence from the Middle East" Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Hyatt Regency Chicago and the Sheraton Chicago Hotel and Towers, Chicago, IL

[সীগ্যাল, ২০১১] Siegel, D.A. (2011), "When Does Repression Work?: Collective Action and Social Networks", The Journal of Politics

[টেইলর, ২০১১] Taylor, Lewis (2011), "Environmentalism and Social Protest: The Contemporary Anti-mining Mobilization in the Province of San Marcos and the Condebamba Valley, Peru", Journal of Agrarian Change, vol. 11, no. 3, pp. 420-39.

[অয়াইডেনার, ২০০৭] Widener, P. (2007), "Benefits and Burdens of Transnational Campaigns: a Comparison of Four Oil Struggles in Ecuador", Mobilization: An International Quarterly, vol. 12, no. 1, pp. 21-36.